একক ৩৩ ❐ মুঘল ভারতে কৃষক বিদ্রোহ

গঠন ঃ

৩৩.০ উদ্দেশ্য

৩৩.১ প্রস্তাবনা

৩৩.২ মুঘল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জায়গীরদার, জমিদার, কৃষকের ত্রিভুজ কাঠামো

৩৩.৩ মুঘল কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান

৩৩.৪ প্রাক্-ঔরঙ্গাজেবের সময়ে কৃষি-বিদ্রোহ

৩৩.৫ ঔরঙ্গাজেবের সময়ে কৃষি-বিদ্রোহ

৩৩.৫.১ কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রেণীবিন্যাস

৩৩.৫.২ কৃষক বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা

৩৩.৫.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে কৃষক বিদ্রোহের অবদান

৩৩.৬ সারাংশ

৩৩.৭ অনুশীলনী

৩৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৩.০ উদ্দেশ্য

মুঘল অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। কৃষি ছিল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপজীবিকা। শোষক ও শোষিতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি। সুতরাং আশা করা যায় এই একক পাঠের পর শিক্ষার্থীরা—

- মুঘল যুগের কৃষি-অর্থনীতিতে গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্ব ও স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবেন।
- বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও অধিকার বিচার করতে সক্ষম হবেন।
- শ্রেণীগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব জানবার পর কৃষক বিদ্রোহের কারণ আলোচনা করতে পারবেন।
- মুঘল ইতিহাসের পটভূমিতে—কৃষক বিদ্রোহের মূল্যায়ন করবার পর প্রচলিত রক্ষনশীল মতবাদগুলিকে সমালোচনা করতে শিখবেন এবং একই সঙ্গো নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন।

৩৩.১ প্রস্তাবনা

সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমে মুঘল রাজশক্তির স্তম্ভ মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও দ্বন্দ্বগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল এবং

এদের মিলিত চাপে সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল ও প্রায় অচল হয়ে এসেছিল। ঠিক সেই সময়ই মুঘল রাষ্ট্রকে আর একটি বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, তা হ'লো সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে পৌনঃপুনিক কৃষক বিদ্রোহ। কর ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত কৃষিজাত পণ্যকে আত্মসাৎ করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছিল, যে অর্থ কৃষকের কাছ থেকে তারা গ্রহণ করেছিলেন তার কোনকিছুউই উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে তারা ফিরিয়ে দেননি ; ফলে রাষ্ট্র ও তার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দাবিকে ভারতীয় সমাজ বিশেষত কৃষিজীবী সমাজ ও তার নেতৃবৃন্দ কোনদিনই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মুঘল আমলের প্রথম দিকে এই বিদ্রোহগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি ; কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমে একদিকে মুঘল সামরিক শক্তির দুর্বলতা ও আন্তর্দ্বন্দ্বগুলি যেমন প্রকট হয়ে উঠল তেমনি সেই সঙ্গো বাড়ল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজপুরুষদের শাসন। ফলে বিদ্রোহ ব্যাপক রূপ ধারণ করল এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে দমন করবার দক্ষতা আর মুঘল রাজশক্তির ছিল না। তলার দিকের নেতৃত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারি জমিদার শ্রেণী নিজেদের অসন্তোষকে চরিতার্থ করবার জন্যে কৃষক শ্রেণীকে ব্যবহার করত। একদিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা ও অন্যদিকে জনসমর্থনপুষ্ট আঞ্চলিক শক্তির উত্থান—এই দুই-এর চাপে মুঘল সাম্রাজ্য আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। কৃষক বিদ্রোহের ফলে অষ্টাদশ শতকের মুঘল রাষ্ট্রের অবক্ষয় এবং তার ফলে নানা বিপর্যয় বোধহয় কোন অবাস্তব ঘটনা নয়।

মুঘল যুগে কৃষক বিদ্রোহ নানা ঐতিহাসিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ইরফান হাবিবের তত্ত্ব অনুসারে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্কট, অত্যধিক শোষণ এবং তার ফলে জমিদার ও কৃষকদের প্রতিরোধ আন্দোলনই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু গবেষক সন্দিহান কারণ তার উপস্থাপনার যুক্তি-বিন্যাস পুরনো ধাঁচের ; নতুন তথ্যপুঞ্জের বিশেষ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, অপরদিকে আন্দ্রে উইংক ও বেইলি ঔপনিবেশিকতার দেশজ ভিত্তি খোঁজ করছেন। আর. পি. রাণার গবেষণায় দেখা যায় যে, কৃষক বিদ্রোহের রকমফের আছে। স্থআনীয় দ্বন্দ্ব ও পরিস্থিতি এলাকাভিত্তিক প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্র নির্ধারণ করেছে। বিদ্রোহের এই বৈচিত্র্য হাবিবের একমাত্রিক ছকে ধরা পড়ে না।

৩৩.২ মুঘল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জায়গীরদার, জমিদার, কৃষকের ত্রিভুজ কাঠামো

মুঘল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জায়গীরদারি প্রথার মাধ্যমে সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ নিজেরাই এক বিরাট শোষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। মনসবদারেরা খুব কম সময়ই নগত অর্থে বেতন পেতেন, অধিকাংশ সময় সরাসরি বেতনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যের একটি অংশের রাজস্ব তাদের মধ্যে বন্টন করা হ'ত, জায়গীরের মধ্যে দুটি ভাগ ছিল "তনখা জায়গীর" ও "ওয়াতন জায়গীর"। বেতনের পরিবর্তে যে জায়গীর দেওয়া হ'ত তাকে বলা হ'ত "তনখা জায়গীর"। যেসব জায়গীরদার তাদের রাজস্বের অংশ নিজের রাজ্য থেকে ভোগ করতেন এবং সেই আয় উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করতে পারতেন, তাদের বলা হ'ত "ওয়াতন জায়গীর"। এই জায়গীরদাররা মুঘল আমলের আগে থেকেই ছিলেন এবং আকবরের সময় থেকেই এরা মুঘল শাসনাধীনে চিলেন। এদের রাজ্যগুলি স্বয়ংশাসিত ছিল। "ওয়াতন জায়গীর" বংশানুক্রমিক ভোগ করা চলত

এবং সেখানে কোন বদলি ছিল না। এইসব সুবিধার জন্যে পরবর্তীকালে বহু জায়গীরদার তাদের "তনখা জায়গীর"কে "ওয়াতন জায়গীরে" রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করতেন।

জায়গীরদারদের প্রধান সমস্যা ছিল সম্ভাব্য রাজস্বের পরিমাণ (জমা) থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণের (হাসিল) পার্থক্য। এই পার্থক্যের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং শাসক শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার বাইরে অন্য কোনভাবে অর্থ গংগ্রহ তাদের অইধকার ছিল না ; এইভাবে জায়গীরদারেরা মুঘল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। "আভিজাত্য" এবং "তরবারী" এই দুই নীতির উপর ভিত্তি করে মুঘল সামন্তশ্রেণী গঠিত হ'ত। এই দুই নীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল মুঘল সম্রাটদের কাজ এবং এই ভারসাম্য বিনষ্ট হ'লেই—সামন্তশ্রেণী একটি রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হ'ত।

কৃষির অতিরিক্ত সম্পদ আহরণে জায়গীরদারির মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। রাজস্বের পাঁচভাগের ৪ (চার) ভাগই জায়গীরদাররা পেতেন। গবেষণায় দেখা গেছে, শাহজাহানের রাজত্বকালে মনসবদারদের শতকরা ৫.৬ ভাগ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ৬১.৫ ভাগের অধিকারী ছিলেন। প্রায় ৪৫০ জন লোক গোটা সাম্রাজ্যের পাঁচ ভাগের ৩ (তিন) ভাগ রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করত। সম্পদের এই প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণ মনসবদারদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে তীব্র করছিল। "ডামা" ও "হাসিলের" পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র সমস্ত কৃষিসম্পদের এক-চতুর্থাংশ ভোগ করত। সমসাময়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, কৃষি-অর্থনীতিতে রাজস্বের বিপুল চাপ বর্তমান ছিল। কৃষক তার জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু উৎপন্ন করত, তার সবকিছুই রাষ্ট্র করায়ত্ত করত। আকবরের সময় কৃষকদের প্রকৃতপক্ষে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে অনেক বেশি রাজস্ব দিতে হ'ত। কারণ শস্য কাটার সময়ে বাজারে বেশি শস্য আমদানির জন্যে বাজারে শস্যের দাম কম থাকত। আওরঙ্গজেবের সময়ে সরাসরিভাবে স্বীকার করাই হ'ল যে রাজস্বের পরিমাণ শস্য উৎপাদনের গড়পড়তা হারের অর্ধেকের কম হবে না। এর সঙ্গে যদি "জিজিয়া" ইত্যাদি আইনসংগত কর এবং জায়গীরদার ও রাজস্ব কর্মচারীদের বে-আইনী অথচ নির্দিষ্ট ধার্য্যের কথা ভাবা যায়, তাহলে কৃষি-অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন কিভাবে রাজস্বের মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র সামন্তশ্রেণীর মধ্যে বণ্টিত হ'ত তার ধারণা করা যেতে পারে। সম্রাট সমেত বিভিন্ন জায়গীরদারেরা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের এক বিপুল অংশ নিজেরা ভোগ করত এরা একটি পরশ্রমজীবী শ্রেণী মাত্র ছিলেন। এদের অবস্থান থেকে মুঘল কৃষি-অর্থনীতিতে শোষণের তীব্রতা ও চাপ সহজেই অনুমান করা যায়।

জায়গীরদার এবং কৃষকের মধ্যমর্তী শ্রেণী হ'ল জমিদার। এই শ্রেণীটি কৃষকের থেকে স্বতন্ত্র এবং কৃষকদের উপরেই তাদের বিশেষ দাবিগুলি প্রয়োগ করে জমিদর জমি বংশানুক্রমিক স্বত্বে ভোগ করতেন। এবং জমির উৎপন্ন সম্পদে তাদের নিজের বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করতেন। জায়গীরদারদের মতো জমিদারদের সম্রাট নিজের ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করতে পারতেন না। জমিদারেরা কৃষকের উৎপাদনের একটি অংশের দাবিদার—এই দেয় অংশটি রাজস্ব থেকে পৃথক, জমির উপর জমিদারদের দাবি মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছিল। অন্যদিকে তারাই ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষকের যোগাযোগ রক্ষার অন্যতম প্রধান সূত্র। এই যৌথ অধিকার জমিদারকে কৃষক এবং জায়গীরাদরের থেকে পৃথক করে তুলেছে। উদ্বৃত্ত

সম্পদে জমিদারের ভাগ প্রচলিত রাজস্বের দাবির চেয়ে অনেক কম। কিন্তু জমিদার তার গ্রামের কৃষকের জমির মালিক নয়। জমিদার বিদ্রোহী না হ'লে তার অঞ্চলে মোটামুটিভাবে স্বায়ত্তশাসনের অইধকার দেওয়া হ'ত। জমিদারকে দেখতে হ'ত তার এলাকায় কোন অনাবাদী জমি পড়ে আছে কি না, অনাবাদী জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব তার। দ্বিতীয়ত, এলাকার আইনশৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাকে বহন করতে হ'ত। তৃতীয়ত, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকলেও মুঘল জমিদাররা যা খুশি তাই করতে পারতেন না। উদ্বৃত্ত সমপ্দে দজমিদারদের অধিকার আইন ও প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছিল। বৃহৎ জমিদারদের মুঘল সম্রাটরা "মনসব" ও "জায়গীরের" মাধ্যমে মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত করতে চাইতেন। নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা স্বাধীন ছিলেন। আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে, মুঘল শাসনের কাছে আনুগত্য স্বীকার করলে তাদের "ওয়াতেন জায়গীরের" উদ্বৃত্ত ভোগদখলের নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল। মধ্যবর্তী শ্রেণীর জমিদারেরা রাজদস্ব সংগ্রহে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাষ্ট্রকে সাহায্য করত এবং তার ফলে তারা নানারকম সুযোগ সুবিধা পেত এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ ভোগ করত। মধ্যবর্তী স্তরের জমিদারদের নিচে থাকত— "মাল গুজারি" জমিদারেরা। এদের মাধ্যমে কয্ষকদের উপর রাজস্ব ধার্য হ'ত। নিজেদের স্বত্বের পরিবর্তে রাজস্বের একটা অংশ তারা ভোগ করত। জমিদার শ্রেণী সশস্ত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল। নিজেদের জাতি বন্ধনের মাধ্যমে তারা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতেন। দ্বিতীয়ত, জমিদারদের বিশিষ্ট ক্ষমতার উৎস স্থানীয় সার্বিক নয়। তৃতীয়ত, জায়গীরদারদের মতো জমিদারেরাও নিশ্চিন্তভাবে একটি শোষক শ্রেণী। উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ তারা ভোগদখল করতেন ; কিনতু সম্পদের অধিকাংশই আদায় করত রাষ্ট্র। এইজন্যেই জমিদারের সঙ্গো রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংঘর্ষ লেগে থাকত।

কৃষক : মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি ছিল কৃষক। তাদের অধিকার আর কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ করা নিয়ে মুঘল শাসকদের চিন্তার অন্ত ছিল না। জমির উপর কৃষকের ভোগদখল ও অধিকার স্বত্বকে মুঘলরা মেনে নিয়েছিলেন। এই স্বত্বকে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার জমিদারদের ছিল না, অপরপক্ষে জমি ছেড়ে চলে যাবার বা জমি হাতবদল করবার অধিকার কৃষকের বিশেষ ছিল না। রাষ্ট্রের সমস্ত কর্ষণযোগ্য জমি যাতে উপযুক্তভাবে চাষ হয় সেদিকে মুঘল শাসকেরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাই অনাবাদী জমিকে চাষের আওতায় আনলে অথবা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করলে রাষ্ট্রের তরফ থেকে রাজস্বের পরিমাণ কম করা হ'ত। বীজধান, গোরু কেনার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে ধার পাওয়া মুঘল কৃষকদের নূন্যতম অধিকার ছিল। এছাড়া দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকের দেয় রাজস্বের থেকে ছাড় দেওয়া হ'ত। কৃষকদের প্রধান কর্তব্য ছিল—(এক) আপন আপন জমিতে চাষ করা ; (দুই) সময়মতো ধার্য রাজস্ব পরিশোধ করা (তিন) কোন অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষতি হ'লে স্থানীয় কৃষকদের উপর ক্ষতিপূরণ করবার দায় বর্তাত।

অগণিত কৃষককুলের মধ্যে বিভিন্ন স্তরবিন্যাস ছিল। কৃষকদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য স্তর হচ্ছে খুদ-কশথ্-রাইয়ৎ' এরা (এক) নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করতেন ; (দুই) উৎপাদনের উপাদানের মালিকানাও তার নিজের ছিল ; (তিন) নিজেদের গ্রামে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন ; (চার) নিজের জমি বিক্রি ও হস্তান্তর করবার অধিকার এদের ছিল, যদিও সে অধিকারের প্রয়োগ দুর্লভ ; (পাঁচ) ঠিকমত রাজস্ব

পরিশোধ করলে তাকে জমি থেক বিচ্যুত করা যেতচ না। একথা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে "খুদ্-কশথ্:: রায়তদের অবস্থা অন্যান্য কৃষকশ্রেণীর চেয়ে ভাল ছিল।

কৃষকদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে "পাহি-কশথ্" এরা নিজেদের গ্রাম ছাড়াও অন্য জমিদারের আওতায় অন্য গ্রামে কৃষিকার্যের জডন্য নিয়োজিত হ'ত। এদের মধ্যে একদলের উৎপাদনের উপকরণ ছিল না। এদের উপর রাজস্ব ধার্য করা হ'ত উৎপন্ন ফসলের ভাগ হিসাবে। পাহি কৃষকেরা সীমিতভাবে হ'লেও এক স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে চাষষ করতে পারতেন ; কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের শ্রমশক্তি ব্যবহারের বিনিময়ে জমির উপর একজাতীয় অধিকার লাভ করতেন, এই কৃষকেরা সম্পূর্ণভাবে জমির সঙ্গো বাঁধা ছিল না। কিন্তু কৃষি থেকে বাণিজ্য বা অন্য কোন বৃত্তিতে যাবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এছাড়াও অনাবাদী দমিকে আবাদী করবার সময় এদের সাহায্য নেওয়া হ'ত। প্রচুর জমি থাকলে পাহি-কশথ "সহজেই নিজেদের" খুদ-কশথে" রূপান্তরিত করতে পারতেন। অপরদিকে জমির উপর চাপ বাড়লে পাহিদের অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে হ'ত।

তৃতীয় ধরনের কৃষকদের "মুজারিয়ান" বলে উল্লেখ করা হ'ত ; জমির উপর ছিল এদের সাময়িক অধিকার অস্থায়ীভাবে কয়েক বছরের জন্য উচ্চতর কৃষকগোষ্ঠীর কাছ থেকে জমি পেত এবং জমির উপর এদের কোনরূপ "স্বত্ব" জন্মাত না। যদিও কোন কোন দলিলে বংশানুক্রমিকভাবে "মুজারিয়ানদের" উল্লেখ আছে। কিন্তু তারা ইচ্ছেমত নিজের কর্ষিত জমিতে কাউকে বসাতে পারত না বা জমিচাষের ভার অন্য কাউকে দিতে পারত না।

চতুর্থ শ্রেণীর কৃষক হচ্ছে ভূমিহীন চাষীরা। নিম্নবর্ণের লোকেরা যেমন চামার, ধানুকী ইত্যাদিরা নিজেদের দজীহিবকা থেকে সংবৎসরের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারতেন না ; তখন মরসুমের সময়ে বিকল্প হিসাবে কৃষির কাজ করতেন এবং দৈনিক ভিত্তিতে কিছু পেতেন, এইসব চাষীদের জমির উপর কোন স্বত্বই ছিল না, দ্বিতীয়ত, এরাই একমাত্র শ্রেণী—যারা কৃষি ছাড়াও অন্যান্য বৃত্তি থেকে জীবিকা অর্জন করতে পারতেন।

মুঘল আমলে প্রাপ্ত বিভিন্ন দলিল থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের খণ্ডিত ছবি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের অইধকারের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকাই খুব স্বাভাবিক। শআন্ত নিস্তরঙ্গা গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তে এক দ্বন্দ্ব-বিজড়িত কৃষি সমাজকে অনুভব করা যায়।

৩৩.৩ মুঘল কৃষিব্যবস্থার মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান

কৃষকের শ্রমশক্তির উদ্বৃত্তকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে মুঘল শাসক শ্রেণী তাদের বিশাল ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছিল। খাজনা পরিশোধের মাধ্যমেই কৃষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত না ; খাজনার পরেও কৃষককে "আবওয়াব" বা অতিরিক্ত রাজস্ব পরিশোধ করতে হ'ত। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে "আবওয়াব" আদায় করা হ'ত। কিন্তু সম্রাটের হাতে কোন উপায় ছিল না যে যার দ্বারা তিনি এগুলিকে বন্ধ করতে পারেন, সময়ের সঙ্গো আবওয়াবের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কৃষকের কাছে রাষ্ট্রের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং কৃষক ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে চাষ করা পরিত্যাগ করে ; কারণ চাষ করা আর তার পক্ষে লাভজনক নয়। মুঘল

সম্রাটরা জানতেন যে রাষ্ট্রের অতিরিক্ত দাবি কৃষকের জীবনযাত্রার মানকে বিপর্যস্ত করে, জমির উৎপাদিকা শক্তি ব্যাহত হয়, এবং এর ফলে ভবিষ্যতে কৃষক বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। জাহাঙ্গীর থেকে ঔরঙ্গজেব সমস্ত সম্রাট পুনঃপুনঃ তাদের ফারমানে রাজকর্মচারীদের প্রজাপীড়ন থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে সম্রাটের স্বার্থের সঙ্গে জায়গীরদারের ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। জায়গীরদারদের জমির উপর কোন স্বত্ব নেই এবং জায়গীর থেকে যে কোন সময় বদলি করা হ'তে পারে ; এই অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করার কথা সে কখনোই চিন্তা করে না, বরঞ্চ সাময়িকভাবে যতটা সম্পদ লুন্ঠন করা সম্ভব তা করার পর এলাকায় চিরস্থায়ী ক্ষত রেখে যায়।

অবাধ্য জায়গীরদারকে শাস্তি দেবার জন্যে মুঘল সম্রাটরা নানা ব্যবস্থা নিতেন। অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে অভিযুক্ত কর্মচারীকে হয় বদলি নয় বরখাস্ত করা হ'ত। কৃষকের সামর্থ্য ও জায়গীরদারের দাবি উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই ছিল সম্রাটের উদ্দেশ্য। কিন্তু মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থায় নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যে এই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং কৃষকের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের প্রবণতা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ শিল্পীরা ইতিপূর্বে আবওয়াব দেওয়া থেকে ছাড় পেতেন, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে তাদেরও আবওয়াবের আওতায় নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মুঘল শাসকেরা মাপজোখ ও উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করতে শুরু করেন। এই ব্যবস্থা বাংলাদেশের কৃষিসমাজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুর্শিদকুলির ব্যবস্থা শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে সুদৃঢ় করে এবং অন্যদিক থেকে কৃষি সমাজের উপর চাপ বাড়ায় এবং কৃষির উদ্বৃত্তকে রাষ্ট্র আরো নিপুণভাবে আত্মসাৎ করে। এই সময় কৃষি-অর্থনীতিতে এক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল এবং রাজস্বের লোকসান পূরণের জন্যে অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয় এবং তা আদায়ের চাপ আরও বেশি বাড়ে।

পূর্বেকার ঐতিহাসিকেরা মুঘল যুগের এই সঙ্কটকে রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং সমস্ত দায়িত্ব আওরঙ্গজেব এবং তার অনুদার ধর্মনীতি এবং রাজপুত নীতির উপর চাপিয়ে দিতেন। তারা মনে করতেন যে, রাজনৈতিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। দুর্বল অনুদার, স্বার্থপর শাসকশ্রেণী সঙ্কট মোচন করা দূরে থাকুক বৈরীমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা সঙ্কটকে আরও তীব্র করে তুলেছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকেরা সঙ্কটের মধ্যে একটা ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমত, আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব এত তীব্র হয়ে ওঠে যে পুরাতন কায়দায় শাসন করা আর চলে না। এইজন্যেই বোধহয় জায়গীরদারি প্রথা থেকে ইজারাদারি প্রথার জন্ম হয়। দ্বিতীয়ত, কৃষক শ্রেণী ক্রমাগত শোষিত হবার ফলে যখন তারা তাদের শোষণ সম্পর্কে সচেতন হয়, তখন তারা হয় নিজ নেতৃত্বে অথবা মধ্যবর্তী প্রাথমিক জমিদারদের নেতৃত্বে বিদ্রোহে শামিল হয়।

কৃষিকার্যে রত থেকে জমিদারের সম্পদ বৃদ্ধি করা ছাড়াও প্রয়োজনমত কৃষকেরা জমিদারের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিত। সুশিক্ষিত মুঘল অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে তাদের কোন গুরুত্ব ছিল না। মুঘল শাসক কর্তৃপক্ষের শত বাধা এবং গোপনীয়তা সত্ত্বেও গ্রামীণ কর্মকারদের কাছে বন্দুক তৈরি করার কৃৎকৌশল পৌঁছে যায়। এর পরেই মুঘল সৈন্যবাহিনী আর অপ্রতিরোধ্য থাকে না। জমিদারদের যুদ্ধ এখন থেকে

আত্মরক্ষামূলক না হয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়। মারাঠা ও জাঠ বিদ্রোহে কৃষকদের যারা নেতৃত্ব দিয়েচিলেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী জমিদার।

মুঘল কৃষিব্যবস্থা থেকে উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পদের অসম বন্টন এবং মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা অনুৎপাদকভাবে এই সম্পদের ভোগ। যারা তুলনামূলকভাবে বঞ্চিত তাদের একটি স্থায়ী ক্ষোভের অবকাশ সবসময়েই থাকত। জায়গীরদারি সঙ্কট সুপ্ত ক্ষোভ ও আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের স্থিাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসগোষ্ঠীর সম্প্রসারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করল। এই চাপের ফলে কৃষকেরা তাদের ন্যূনতম জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। জায়গীরদারি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জায়গীরদাররা নানারকম চাপ সৃষ্টি করে রাজস্ব আদায় শুরু করেছিলেন। শুরু হয়েছিল এক অসহনীয় নির্মম অত্যাচার, যেখানে সমস্ত কিছু এমনকি নিজের স্ত্রী, পুত্র বিক্রি করেও তার রেহাই থাকত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ফলস্বরূপ কৃষি-উৎপাদনের অধোগতি লক্ষ্য করা যায় এবং জমি থেকে পলাতক কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সমৃদ্ধ জনবসতিপূর্ণ গ্রাম ঘন জঙ্গালে পরিণত হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে রাজস্বের দাবি যে উত্তরোত্তর বেড়েছিল তার একটি কারণ হ'ল ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রচলন। জায়গীরদারেরা প্রায়ই তাদের জায়গীর থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না বলে একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক আয়ের পরিবর্তে রাজস্ব আদায় করবার ভার আর একদল লোকের হাতে ছেড়ে দিতেন যাদের বলা হ'ত ইজারাদার। জমির উপর স্থায়ী কোন স্বার্থ নেই। এই ধরনের নানা লোকেরা ইজারাদার হ'তেন। শুরু হ'ল এক কৃত্রিম প্রতিযোগিতা। এর ফলে "জমা"র পরিমাণ বাড়ল কিন্তু কৃষি উৎপাদন বাড়ল না। ইজারাজাররা লগ্নীকৃত টাকা এবং লাভের আশায় যথেচ্ছভাবে রাজস্ব আদায় শুরু করলেন। কৃষকের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা এবং ইজারাদারের দাবি এই দুই-এর ভারসাম্য নষ্ট হ'ল। ফারুকশিয়ারের আমলে 'খালিসা' জমিও ইজারাদারের হাতে চলে গেলে অবস্থা চরমে এসে পৌঁছল। বোঝা গেল যে, এতদিনের মুঘল ব্যবস্থার প্রচলিত শোষণযন্ত্রের ভারসাম্য চিরতরে বিনষ্ট হ'তে চলেছে। সমসাময়িক গ্রন্থ রিসালা-ই-জিরায়তে স্পষ্ট ক'রে বলা হ'ল যে, "রাজস্ব সংগ্রহে কঠোরতার জন্যে রায়তরা পালাল, পরগনা জনশূন্য হ'ল এবং জমিদার ধ্বংস হ'ল।"

জায়গীরদারদের দাবি সম্পূর্ণ মিটিয়ে দেবার পর জমিদারদের নিজের দাবিতে টান পড়তে থাকে, তখন তারা অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে মুঘল শক্তিকে বাধা দিয়ে শুরু করলেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্যে মুঘল রাজশক্তি জমিদারদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারেনি। জমিদারদের বিদ্রোহকে দলভারী করত কৃষকসমাজ, কারণ বর্ণ ও গোষ্ঠীর দিক দিয়ে দেখলে জমিদার তাদের অনেক কাছের লোক।

শোষন ও অত্যাচার কৃষকদের বিদ্রোহের পথে ঠেলে দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিরোধের প্রথম অবস্থা ছিল চাষাবাস ত্যাগ করে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া. ব্যাপকভাবে স্থানান্তরে যাওয়া কৃষকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানবার প্রাথমিক অস্ত্র।

সশস্ত্র বিদ্রোহ কৃষকের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের অস্ত্র ছিল। মুঘল কর্তৃপক্ষ গ্রামগুলিকে দু'ভাগে ভাগ

করতেন (ক) রাগতি বা শাসত এবং (খ) মেওয়াসি বা বিদ্রোহী। আইন-ই-আকবরীতে বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের প্রতিবাদী মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। এর থেকে মনে হয় কৃষি ও কৃষক বিদ্রোহ মুঘল আমলের শুরু থেকেই বর্তমান। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। অষ্টাদশ শতকে শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি ওয়ালিউল্লা লিখলেন— "কৃষক, বণিক ও কারিগরের উপর প্রচন্ড কর চাপানো হচ্ছে এবং অত্যাচার করা হচ্ছে। ফলে যারা ভীরা তারা পালাচ্ছে আর যারা শক্তিশালী তারা বিদ্রোহ করেছে। একমাত্র করভার কমালেই দেশে শান্তি ফিরে পাওয়া যাবে।"

জাট, রকালি, মারাঠা ও শিখ বিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায়।

৩৩.৪ প্রাক্-ঔরঙ্গজেবের সময়ে কৃষি-বিদ্রোহ

মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি ভারতীয় কৃষিজীবী সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হেনেছিল। সাম্রাজ্য যতই অগ্রসর হচ্ছিল তত কৃষিজীবী সমাজের উপর রাজস্বের দাবি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে প্রজা-বিদ্রোহের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও বিদ্রোহের কারণকে তিনি অতিসরলীকৃত করেছেন। তাঁর মতে, হিন্দুস্তানের ঘন বনজঙ্গল প্রজাদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করে থাকে।

আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। ফলে প্রজা-বিদ্রোহের ঘটনাও বাড়তে থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণায় আকবরের সময়কালে প্রায় ১০৮টি প্রজা বিদ্রোহের ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় ; তবে এদের মধ্যে বিশুদ্ধ কৃষক বিত্রোহ এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধ উভয় ঘটনা মিলেমিশে রয়েছে। ১৫৭২ ও ১৫৭৭ সালে আগ্রার কৃষকরা হাঙ্গামা করে। ১৫৬২ সালে আগ্রার কাছে সাকেৎ গ্রামের কৃষকরা রাজশক্তিকে অস্বীকার করে। আকবর নিজে এই বিদ্রোহীদের দমন করেন। অবিরত বিদ্রোহপরায়ণ এই কৃষককুলকে দমন করার জন্যে আগ্রায় দুর্গ নির্মাণ করতে হয়। কাশ্মীরে মুঘল অধিকারের অনতিবিলম্বকাল পরেই জনবিক্ষোভ দেখা যায়। মুঘল শাসকদের রাজস্ব বৃদ্ধির দাবি কাশ্মীরের জনগণের প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি করে। আকবরের কাশ্মীরে উপস্থিতির সময় এই বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। অবশেষে বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরবাসীর দাবির সঙ্গো রাজকীয় দাবির কিছু আপস করে নিতে হয়। এই বিদ্রোহে একাধারে রাজস্বের হারের তীব্রতা এবং অন্যদিকে সীমান্ত অঞ্চলের রাজাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার সমস্যা—দুটোই কাজ করছিল।

জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী "তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী"তে বিভিন্ন প্রসঙ্গো কৃষক বিদ্রোহের কথা আলোচনা করেছেন। ১৬১০ সনে আগ্রায়, ১৬২২ সনে থাট্টায়, ১৬১১ সনে কনৌজ ও কালপিতে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। ১৬১০ সনে কুতুব খান নামে দরবেশের পোশাকধারী এক ব্যক্তি পাটনা শহরের নিচুতলার লোক নিয়ে বিদ্রোহ করে। প্রত্যেকটি বিদ্রোহকে মুঘল সামরিক শক্তি নির্মমভাবে দমন করে। যেহেতু বিদ্রোহীরা রাজশক্তিকে কোন আঘাত করতে পারেনি ; জাহাঙ্গীর এইসব বিদ্রোহকে কোন গুরুত্ব দেননি ; প্রসঙ্গাক্রমে উল্লেখ করেছেন মাত্র কিন্তু মনে হয় এইসব বিদ্রোহ নিত্যকার ব্যাপার ছিল।

জাহাঙ্গীরের আমলে কোন এক সেনানায়কের প্রতিবেদন কৃষক বিদ্রোহের প্রতি মুঘল রাজশক্তির প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। বিদ্রোহ, বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ও তার মোকাবিলায় মুঘল সৈন্যের

ব্যবহার এই চিঠিতে বিশদভাবে লেখা রয়েছে। জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। অত্যন্ত সহজভাবে বিদ্রোহীদের হত্যা করা, তাদের স্ত্রী-পুত্রদের দাসে পরিণত করা, বিজয়ী সৈন্যদের লুঠের মাল ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। এই সময়ে মুঘলরা গোটা পূর্বভারত জুড়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল এবং সমগ্র কুচবিহার ও আসাম সীমান্ত জুড়ে তাদের নানারকম কৃষক বিদ্রোহের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পাইক সর্দার সনাতনের নেতৃত্বে খুন্তাঘাট বিদ্রোহ এবং হাতিখেদা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দুই বিদ্রোহই দমন করেছিল মীর্জা নাথানের নেতৃত্বে এক বিশাল মুঘল বাহিনী। কৃষকরাই ছিল এই বিদ্রোহগুলির নেতা। আবার জমিদারদের বিদ্রোহেরও বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। ১৬১৮ সালে শোভাস কুলি নামে এক রাজপুরুষ বিদ্রোহ করে এবং তাকে সাহায্য করেছিল কৃষকরা। ১৬২০ সনে কিসওয়াব অঞ্চলে জমিদার ও কৃষকদের আর একটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। "পেশাকশী" দমিদারদের বিদ্রোহের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হ'লো শাহজাহানের আমলে বন্দেলাদের বিদ্রোহ। আবার উপজাতীয় এবং প্রতিবাদীয় ধর্মীয় আন্দোলনের দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায়। আকবরের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি, ইউসুফজাই প্রভৃতি পাঠান ও উপজাতিদের মধ্যে "রোশনিয়া" আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাক্-ঔরঙ্গাজেবের সময়ে এই সমস্ত বিদ্রোহগুলির কথা স্মরণ রাখলে একটি ব্যাপার সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তা হ'ল অষ্টাদশ শতকের কৃষক আন্দোলন পূর্ব যুগের ঐতিহ্য অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল, শুধুমাত্র পরিস্থিতির পরিবর্তনে এর তীব্রতা এবং ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে, প্রাক-ঔরঙ্গাজেব আমলের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির কয়েকটি সুস্পষ্ট রূপ ছিল, যেমন বিশুদ্ধ কৃ,ক বিদ্রোহ, বিশুদ্ধ সামন্ত বিদ্রোহ এবং উপজাতিদের বিদ্রোহ—এসবের মধ্যে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন নানাভাবে জড়িত ছিল। এই সমস্ত রূপই আওরঙ্গাজেবের ও তৎপরবর্তী যুগের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

৩৩.৫ ঔরঙ্গাজেবের সময়ে কৃষক বিদ্রোহ

ঔরঙ্গাজেবের সময়ে ব্যাপকভাবে কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায় এবং এরা অনেক ক্ষেত্রে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনেছিল। আগে প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা ঔরঙ্গাজেবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়ার উত্তরে "হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া" বলে বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই মন্তব্যকে অস্বীকার করেছেন কারণ তাঁদের মতে, সমসাময়িক তথ্য বিদ্রোহের কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভের দিকে নির্দেশ করে—ধর্মীয় দিকে নয়। বিদ্রোহের চরিত্র এবং শাসকদলের আচরণ বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক প্রয়োজন নির্ধারিত করেছে, সাম্প্রদায়িকতা নয়।

ঔরঙ্গাজেব প্রথম কয়েক বছর শান্তিতে থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হ'তে হয়। আঞ্চলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হ'লেও মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তিকে অস্বীকার করবার প্রবণতা এই সমস্ত বিদ্রোহগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিদ্রোহের সংখ্যা এবং ব্যাপ্তি প্রসারিত হ'লে মুঘল রাষ্ট্রের পক্ষে তা দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করে। এই বিদ্রোহগুলির প্রারম্ভিক সাফল্য মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং তার অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে ওঠে। ফলে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ দুর্বল হয়ে

পড়ে। বিদ্রোহগুলি দমন করতে গিয়ে ঔরঙ্গাজেব কোন নতুনত্ব দেখাতে পারেননি। প্রচলিত পথে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাকে রাষ্ট্রের সম্পদের বিনাশ ঘটাতে হয়েছিল কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তার উত্তরসূরীদের আমলে সমস্যার তীব্রতা আরও বেলেছে ক্রমশ তা সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছে।

ঔরঙ্গাজেবের সময় কৃষক ও নিম্নবিত্ত কৃষক ও নিম্নবিত্ত লোকেদের যেসব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে প্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে ১৬৮০-৮৫ সালে গুজরাটের "মাতিয়া" নামক এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। গুজরাট অঞ্চলে খাদ্যসঙ্কচ মূল্যবৃদ্ধির সমস্যাকে যথাযথভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমাধান করতে পারেননি। রৌপ্যমুদ্রার অভাব ঘটলে কৃষকের পক্ষে নগদে খাজনা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে—তা আদায়ের জন্যে অত্যাচার শুরু হয়। অর্থাৎ এই সময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর এবং কৃষক—কারো অবস্থাই ভালো ছিল না এবং তারা অন্যায়ের প্রতিকারের আশায় ধর্মীয় নেতৃত্বের অধীনে সমবেত হয় এবং বিক্ষোভটি সরাসরি মুঘল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এছাড়াও গুজরাটের কোলি কৃষক সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ঔরহ্গজেবের আমলে শুরু হ'লেও পরবর্তী সম্রাট জাহানদার শাহের আমলে অব্যাহত থাকে। গুজরাট অঞ্চলের আদিম বাসিন্দা হিসাবে জমির উপর তাদের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার তারা হারিয়েছিল। বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে হৃত অইধকার ফিরে পাবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, মুঘল শাসক অর্থাৎ আমিন ও ফৌজদারের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই একথা উর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষকে তারা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল। তৃতীয়ত, এর সঙ্গো জড়িত ছিল সম্প্রদায় হিসাবে বর্ণব্যবস্থায় একটি সম্মানজনক স্থান পাবার চেষ্টা। উত্তর ভারতে (বর্তমান আমেথি অঞ্চলে) কুর্মি কৃষক বিদ্রোহ হয় আনুমানিক ১৬৭০-৮০ সনের মধ্যে। ধর্মীয় পটভূমিতে এই বিদ্রোহ শুরু হ'লেও জমিদারেরাই ছিল এই আক্রমণের লক্ষ্য। এই বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ছিল এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। বিদ্রোহীরা প্রতিবেশী মুসলমানদের বিদ্রোহে শামিল হবার আহ্বান জানায় ; অপরদিকে মুঘল রাষ্ট্রশক্তি বিধর্মী জমিদারদের পক্ষ নিয়ে স্বধর্মাবলম্বী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যেতে কোন ভাবনাচিন্তা করেননি।

মুঘল আমলে আর একটি বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল সৎনামী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে। ১৬৭২ সনে "সৎনামী" বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল ছোট ব্যবসায়ী আর গ্রামীণ কারিগরের দল। এই বিদ্রোহ ও পূর্বোক্ত কৃষি-বিদ্রোহগুলির মত ধর্মীয় পটভূমিতে আবৃত ছিল। কিন্তু বিদ্রোহের কারণ ছিল পার্থিব। মুঘল শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই প্রাথমিকভাবে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহের তীব্রতা এবং বিদ্রেহীদের বিরত্বের কথা সমসাময়িক বিবরণে লেখা আছে। রাজকীয় সৈন্যরা সৎনামীদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল ফলে বিদ্রোহ দ্রুত প্রসারিত হয়। রাজধানীর সন্নিকটে এই বিদ্রোহ দমন করতে ফৌজদার/শিকদাররা ব্যর্থ হ'লে স্বয়ং ঔরঙ্গাজেবকে এই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হ'তে হয়।

উপরিউক্ত বিদ্রোহগুলিতে জমিদারদের ভূমিকা স্পষ্ট নয়। এটা সত্য যে, জমিদারেরা ক্ষুদ্র চাষী, কারিগরের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেনি। কিন্তু সম্মিলিতভাবে কৃষক ও জমিদারদের নেতৃত্বে "জাঠ" বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। যমুনা ও আগ্রার মধ্যবর্তী এই "জাঠ" কৃষকদের মুঘল সরকারি ঐতিহাসিকদের বিবরণে "চিরবিদ্রোহী" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকের বিভিন্ন সময় যেমন ১৬২৩, ১৬৩৪ এবং ১৬৪৫ সনে এরা পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ করে। যদিও এইসব বিদ্রোহ অচিরেই দমন করা হয়।

জাঠরা ছিল মূলত একটি কৃষিজীবী শ্রেণী এবং এদের নেতৃবৃন্দ ছিলেন আঞ্চলিক জমিদার। জাতিগত ঐক্য এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে একটি সংহতি এনেছিল। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ মুঘল শাসকদের অন্যান্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৬৮৬-৮৮ সনে রাজারাম জাঠ সিনসিনওয়ার কেমকে নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন এবং কৃষকেরা মুঘল ফৌজদার ও জায়গীরদারদের খাজনা দিতে অস্বীকার করেন। রাজারাম নিহত হ'লেও চূড়ামনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ চলতে থাকে। মূলত জমিদারদের আন্দোলন হ'লেও কৃষক শ্রেণী ও অন্যান্য নিচু জাতি এই আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্ণসংহতি, পুরনো গোষ্ঠীকে অবদমিত করে নতুন গোষ্ঠীর উত্থান, আঞ্চলিক কৃষক বিক্ষোভ ইত্যাদি একসঙ্গো একাকার হয়ে জাঠ বিদ্রোহকে একটি জটিল চরিত্র দান করেছে। প্রথমবারের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে স্বয়ং সম্রাটকে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। ১৬৮৬ সালে জাঠেরা দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করলে বচ্ছুয়া নেতা বিষেণ সিং এদের বিরুদ্ধে কিছুটা সফলতা লাভ করেন। তা সত্ত্বেও জাঠ বিদ্রোহকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়নি। জাঠ নেতৃত্বের দ্বারা গঠিত ভরতপুর রাজ্যকে পরবর্তীকালে মুঘল রাষ্ট্রশক্তি স্বীকার করে নেয়।

কৃষক ও জমিদারের সম্মিলিত বিদ্রোহের অপর একটি দৃষ্টান্ত হ'ল বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার শোভা সিংহ-এর বিদ্রোহ। বাগদি প্রজাদের আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে শোভা সিংহ বর্ণব্যবস্থার ওপরে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষিব্যবস্থাজনিত সংকটের দিনে মধ্যবর্তী স্তরের রাজস্ব সংগ্রহকারী জমিদার বর্ধমানের কৃষ্ণরামের সঙ্গো আঞ্চলিক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদার শোভারামের বিরোধ ঘটে। তার দলে যোগ দেয় বাগ্‌দি কৃষকেরা ; মুঘল রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাদের অনেক বক্তব্য ছিল। পরে পাঠানরাও তার দলে যোগ দেয়। অর্থ সংগ্রহের জন্যে লুঠতরাজ করাকে আন্দোলনকারীরা একটা উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এর ফলে তারা সমাজের অন্যান্য স্তরের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন। উৎসের সঙ্গো সংযোগ ছিন্ন হয়। জমিদার ও কৃষকের যৌথ আন্দোলন প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হ'ল।

উপজাতীয় আন্দোলনের একটি দৃষ্টান্ত হ'ল "ঘটক" নামক আফগান উপজাতির বিদ্রোহ। ১৬৭০ থেকে ১৬৮০ সাল অবধি এরা সক্রিয়ভাবে মুঘল রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করেছিল। উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উপজাতি ও মুঘল রাষ্ট্রশক্তির বিরোধ এই আফগান আন্দোলনের অন্যতম একটি কারণ। এই সঙ্গো যুক্ত হয়েছিল উপজাতির সম্মানের প্রশ্ন এবং সেই সম্মান রক্ষা করার জন্যে একত্রে লড়াই করবার আবেগময় ইচ্ছা।

সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে মুঘল সাম্রাজ্য ও মুঘল শাসকশ্রেণীর পক্ষে যেটি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হ'ল মারাঠাদের উত্থান। এই ঘটনাটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। শিবাজী প্রথম জীবনে জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। মোরে ওয়াতদনদারকে কৌশলে হত্যা করে শিবাজী তার জমিদারি দখল করেছিলেন। শিবাজীর অভ্যুত্থানের সঙ্গো জাতে ওঠা এবং স্থানীয় নতুন জমিদারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত। শিবাজীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন ক্ষমতাশালী ভূমিজ শক্তিকে খর্ব করে নিজের লোকদের প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করা। বিজাপুর সরকার তাকে দমন করতে ব্যর্থ হ'লে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গো তার সংঘাত বাধে, কারণ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে এবং পশ্চিম উপকূলের সঙ্গো

উত্তর ভারতের বাণিজ্যপথের ওপর এক নতুন রাজ্য ছিল মুঘল রাষ্ট্রের পরিপন্থী। সিবাজীকে দমন করার জন্যে মুঘল সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হ'ল। মুঘল সামরিক মর্যাদা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষুণ্ণ হ'ল যখন শায়েস্ত খাঁর মত সেনাপতিকে পিছু হঠতে হ'ল এবং সমৃদ্ধ সুরাট বন্দর ও শহর লুন্ঠিত হ'ল। ১৬৬৫ সালে জয়সিং হের সাফল্য মুঘল মর্যাদাকে কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হ'ল। ১৬৬৬ সনে মুঘল কারাগার থেকে শিবাজীর পলায়নে মারাঠা সমস্যা সমাধানের সব পথ বন্ধ হয়ে গেল।

সমসাময়িক লেখক ভীমসেনকে অনুকরণ করে অধ্যাপক ইরফান হাবিব মহারাষ্ট্রের মুঘল সৈন্যের পরাজয়ের কারণকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। ভীমসেনের মতে, দাক্ষিণাত্যের কৃষকুকুল শিবাজীর উত্থানের বহু পূর্ব থেকেই জমিদার ও জায়গীরদারদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিলেন। মুঘল রাষ্ট্রীয় শক্তির ভূমির উপর দাবি যত বেড়ে যাচ্ছিল, ক্ষুদ্র কৃষক এবং অন্যান্যরা আর কোন পথ না পেয়ে মারাঠাদের দলে যোগ দিচ্ছিলেন।১৬৫২ খ্রিস্টাব্দের আওরঙ্গাজেব যখন দ্বিতীয়বারের জন্য দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে এসেছিলেন, মুঘল শাসকদের অত্যচারে সমস্ত দক্ষিণ দেশ শ্মশানের আকার ধারণ করেছিল। ১৬৫৮-তে রাজা হবার পূর্বেই দাক্ষিণাত্যের কৃষকেরা শিবাজীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মুজাফ্ফর আলমের মতে, মারাঠা আন্দোলনের সাফল্যের পেছনে ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মারাঠারা মুঘল শক্তিকে অস্বীকার করার ফলে জমিদার শ্রেণীর একাংশের মধ্যে মুঘল সরকার সম্বন্ধে আর ভীতি থাকে না। দাক্ষিণাত্যের জমিদারেরাও এই সুযোগে মারাঠাদের পক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু মারাঠা শক্তি যখন এইসব জমিদারদের উপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করলেন, তারা তখন মুঘল-মারাঠা দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের ক্ষমতার ভিত গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন।

ঔরঙ্গাজেব দাক্ষিণাত্যে এলে মধ্যবর্তী জমিদারেরা লাভের আশায় মুঘলদের দিকে এল আবার প্রাথমিক স্তরের জমিদারেরা মধ্যবর্তী জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে মারাঠাদের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে উভয় স্তরের জমিদারদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মুঘলরা ব্যাপক সমর্থন পায় এবং মারাঠারা প্রায় সর্বত্র পরাজিত হয় কিন্তু বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে জায়গীরদারি সঙ্কট চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। সকলকে সন্তুষ্ট করা মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আর সমভ্বপর ছিল না। মুঘল শাসনকর্তারা সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্যে নতুন করে কর বসাতে শুরু করলেন। ফলে উভয় স্তরের জমিদারেরা মুঘলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং পেশোয়াদের নেতৃত্বে মারাঠাশক্তির পুনরুত্থান হয়। জুলফিকার খান শাহুকে সমর্থন করলে এবং তাকে বৈধ মারাঠারাজা বলে স্বীকার করে নিলে, বহু মারাঠা নেতা সাতারার নেতৃত্বে আবার নতুন করে সংঘবদ্ধ হ'লেন। ফলে বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের চতুর্থ বছরে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আবার মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে উঠল ?। মুঘল-মারাঠা দ্বন্দ্বে আইন-শৃঙ্খলা পতনের ফলে জমিদার কৃষকেরা রাষ্ট্রশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে মারাঠা চৌথ, মুঘলদের ভূমিরাজস্বের দাবি উভয়ের চাপ দিন দিন বাড়ছিল। জমিদাররা অনন্যোপায় হয়ে বিদ্রোহের পথ ধরলেন। তাদের অসন্তোষের পূর্ণ সুযোগ নিলেন মারাঠারা। দাক্ষিণাত্যে ‘চৌথ’ ও ‘সরদেশমুখী’ আদায় করার অনুমতি পেলে এই নতুন শক্তি মুঘল শাসনযন্ত্রের সঙ্গো একত্রিত হয়ে যায়।

পেশোয়াদের সময় মারাঠা শক্তির চরিত্র পরিবর্তিত হচ্ছিল। তখন মহারাষ্ট্র একদল বংশানুক্রমিক জায়গীরদারের যৌথ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। মুঘল শক্তি একে দমন করতে না পেরে এর সঙ্গে আপস করে নেয়। অষ্টাদশ শতকের প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে নিপীড়িত কৃষকশ্রেণী বিভিন্ন সময়ে মারাঠা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ; কিন্তু মারাঠাশক্তি কোন সময়েই দরিদ্র কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করত না। রাজস্ব আদায়ে মারাঠা রাষ্ট্রক্ষমতার নির্দয়তার মুঘলদের চেয়ে কিছু কম ছিল না। শিবাজীও তার অইভযানে কৃষকদের রেহাই দেননি। স্বয়ং আওরঙ্গজেব মারাঠা কৃষকদের মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসেছিল বলে মনে করতেন।

শিখদের আন্দোলন শুরু হয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠাকামী সম্প্রদায়ের নেতার মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করাবর জন্যে পরবর্তী পর্যায়ে এটি সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং এতে যোগ দেয় কৃষক শ্রেণী। শিখ বিদ্রোহের অন্তর্গত কৃষক আন্দোলন নানারকম স্তর বিভাজন দেখা যায়। পরে এখান থেকে বেরিয়ে আসে সামন্ততান্ত্রিক সর্দারদের নেতৃযত্বে পরিচাতি মিস্‌লগুলি। এই আবর্তনের ফলে পাঞ্জাব থেকে মুঘল নিয়ন্ত্রণ ও আফগান শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়।

শিখধর্মের শান্তরূপ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনে যাবার একটি ঐতিহাসিলক পর্যায় আছে। শিখধর্মের প্রথম সমর্থক ছিল ক্ষত্রীরা। এরা মূলত ব্যবসায়ী। শেষ পর্যায়ে সমর্থক ছিল জাঠরা। এরা সবাই কৃষক। কৃষিব্যবস্থার সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর চাপ বাড়লস এবং তারা সবাই প্রতিকারের আশায় অস্ত্র হাতে নিল।

বিভিন্ন পর্যায়ে শিখ আন্দোলন বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখি, ব্যবসায়ী ক্ষত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তেগবাহাদুর গুরুপদে নির্বাচিত হচ্ছেন। তার আমলের প্রথম দিকে আওরঙ্গাদেজব শিখদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতেন না বরং তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু শিখধর্মের সংগটন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করাবার জন্যে ভক্তদের কাছ থেকে নিয়মিত কর গ্রহণ করা হ'তে থাকে এবং পরে তা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে যায়। এই ব্যবস্থা সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে আওরঙ্গজেব মেনে নিতে পারেননি। এই কারণেই তেগবাহাদুরের বিরুদ্ধে তিনি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিখ আন্দোলনের মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠাকামী জাঠ সম্প্রদায়ের উত্থান লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পর্যায়ে গুরুগোবিন্দ এদের একটি সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেন। কতকগুলি আনুষ্ঠানিক চিহ্ন ধারণ ও আচার—আচরণের মাধ্যমে শিখরা সশস্ত্র প্রতিরোধকে তাদের ধর্মের অঙ্গা করে নিল।

প্রথম থেকেই খালসার সমর্থ ছিল জাঠ-কৃষক সমপ্রদ্যায়। গুরুপদের অবসান এবং খালসার হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণের ফলে জাঠ কৃষকদের সমতার দাবি স্বীকৃত হ'ল। অন্যদিকে ক্ষত্রীদের ক্ষমতার অবসান ঘটল। ক্ষত্রী ও ব্রাহ্মণ শিষ্যদের সঙ্গে জাঠ কৃষকদের অন্তর্বিরোধের একটি ক্ষেত্র তৈরি হ'ল। আনুমানিক ১৬৯২ সাল পর্যন্ত গুরুগোবিন্দ মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনেনি কিন্তু গুরুগোবিন্দ পার্বত্য প্রদেশের আনন্দপুরের চারিধারে প্রায় ১০০ মাইল বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে নিজের ও তার অনুগামীদের জন্যে স্বতন্ত্র এলাকা স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন। পার্বত্য রাজারা উদ্বৃত্ত সামাজিক সম্পদের নতুন

ভাগীদারকে পছন্দ করেননি। তারা মুঘল কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করে। মুঘল সৈন্যের হস্তক্ষেপে গুরু আন্দপুর থেকে বিতাড়িত হ'লেন। এরপরে গুরুগোবিন্দ তার বক্তব্যকে সম৪ন করে আওরঙ্গাজেবকে চিঠি লেখেন। আওরঙ্গাজেব তার উত্তরে গুরুগোবিন্দকে তার আর্জিসহ দেখা করতে বলেন। দক্ষিণ ভারতে যায়োর পথে গুরুগোবিন্দ আততায়ীর হাতে নিহত হন। সম্রাট বাহাদুর শাহ এর পরে গুরুগোবিন্দের দাসিসকল মেনে নেন।

চতুর্থ পর্যায়ে বান্দার সময়ে শিখ আন্দোলনের পটভূমি জাঠ অধ্যুষিত দোয়াব অঞ্চলে শুরু হয়। গোটা পাঞ্জাব জুড়ে কৃষিব্যবস্থার উপর চাপ পড়ে এবং রাজস্বের হার বাড়ে। নিপীড়িত কৃষকেরা দলে দলে শিখধর্মের আশ্রয় নেয়। রাজস্বের দাবি অতিরিক্ত বাড়লে পাঞ্জাবের জমিদারেরাও সশস্ত্র প্রতিরোধের আশ্রয় নেয়। ছোট ছোট মালগুজারী জমিদারেরা বান্দার পক্ষে ছিলেন। তিনি নিজস্ব করব্যবস্থার মাধ্যমে মুদ্র-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং সর্বদাই পাল্টা রাষ্ট্র সংগঠন গড়ে তোলার ইঙ্গিত দিতেন। মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও জমিদারেরা লাভের আশায় বান্দার দলে যোগ দেয়।

কিন্তু জাঠ জমিদার এবং ক্ষত্রী ব্যবসায়ীরা শিখ হওয়া সত্ত্বেও বান্দার আন্দোলনকে নানা কারণে সমর্থন করতে পারেনি। শিখ আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক স্থিাবস্থা ব্যাহত হচ্ছিল যা ব্যবসায়ীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্যে কাপড়ের ব্যবসায়ী ও তাঁতীরা শিখদের বিরুদ্ধে মুঘলদের পক্ষে যোগ দেয়। মুঘল শাসকেরাও ক্ষত্রী ও শিখদের বিরোধিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু শিখদের জনসমর্থন ছিল খুব বেশি ফলে মুঘল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

মুঘল-শিখ সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাহাদুর শাহ ও পরে ফারুকশিয়ারের আমলে সামনাদ খাঁ ও জাকারিয়া খানের প্রচেষ্টায় এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৭১৫ সালে বান্দাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ১৭৫০-এর দশকে আহমদ শাহ আবদালির পাঞ্জাব অভিযান এবং মারাঠা প্রতিরোধের সময় পাঞ্জাবে আবার শিখ শক্তির পুনরুভ্যুত্থান ঘটে। এটাকে বলা যায় মিস্‌লদের যুগ। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের আধিপত্য সৃষ্টি হয় এর ফলে সমগ্র পাঞ্জাব থেকে মুছে যায় মুঘল রাষ্ট্রক্ষমতা ও আফগান শক্তি।

৩৩.৫.১ কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রেণীবিন্যাস

বিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণীর অংশগ্রহণের উপর কৃষক বিদ্রোহের তীব্রতা ও গতিমুখ নির্ভর করে। কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে বিদ্রোহের শ্রেণীবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। জাঠ ও মারাঠা আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল জমিদার শ্রেণীর হাতে। এরা ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণী। জঙ্গী আনেদ্দালনের মধ্যে কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের সমাবেশ দেখা যায়। বান্দার নেতৃত্বে শিখ সমাজের আন্দোলনে কৃষিসমাজের একেবারে নিম্নবর্গের লোকদের দেখা দেয়। ফলে এই আন্দে্লনে দজঙঘঞ্জী ্নোভাব অনেক বেশি। এই আন্দোলনের নায়কদের মুঘল রাষ্ট্রের অংশীদার করা হয়নি বরং তাদের নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। দাসি/কুর্মি/বান্দার নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা একই সঙ্গো রাষ্ট্র-বিরোধিতার সঙ্গো জমিদার শ্রেণীরও বিরোধিতা করেছে।

জমিদার শ্রেণীর লড়াই (এক) ক্ষমতা বিস্তারের জন্য ; (দুই) অধিকার পাওয়ার জন্যে। ফলে এই লড়াই অনেক বেশি আগ্রাসী এবং জোরদার। ইরফান হাবিব মনে করেন যে, মুঘল যুগের কৃষক বিদ্রোহে কৃষকের

শ্রেণীচেতনার প্রকাশ পাওয়া যায়। জমিদারের স্বার্থচেতনার দ্বারা শ্রেণীচেতনা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় যেমন সৎনামী বিদ্রোহে শ্রেণীচেতনার প্রাথমিক উন্মেষ দেখা যায়। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস যেখানে অগ্রসর হয়েছে সেখানেই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। গ্রামীণ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তারা নানারকমভাবে প্রতিবাদ করেছেন।

৩৩.৫.২ কৃষক বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা

মধ্যযুগের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের গুরুত্ব সীমাহীন। ধর্মের দুটি রূপ ছিল, একটি সরকারি ধর্মমত, যা সমাজ ব্যবস্থাকে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখে অপরটি প্রতিবাদী ধর্মমত—সুফী ও ভক্তিবাদ-বিশিষ্ট ধর্মমতকে এর মধ্যে ধরা যায়। ধর্মের বাতাবরণের মধ্যেই এইসব বিদ্রোহ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। শিখদের আন্দোলন ও সৎনামীদের বিদ্রোহকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্যে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ধর্মগুলি বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করে। বর্ণহব্যবস্থার প্রভাব শিথিল হ'লে নিম্নবর্ণের লোকদের প্রাধান্য তুলনামূলকভাবে এখানে একটা পর্যায়ে স্থায়ী হয়। ধর্মের নানা ধরনের ভূমিকা কৃষকসমাজে থাকে—ধর্মসংহতিও আসতে পারে ; বিভেদও সৃষ্টি করতে পারে। জমিদারশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে সংহতি আনতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আবার সৎনামীরা বিদ্বেষবশত যখন মসজিদ ধ্বংস করে তখন হিন্দু ও মুসলিম কৃষককুলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

অপরদিকে সরকারি ধর্মমত প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পুরাতন কালের পাঠ্যপুস্তকে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কৃষক বিদ্রোহগুলিকে দেখান হয়েছ। কৃষক বিদ্রোহগুলির পিছনে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ কাজ করেছে, সম্রাটের ব্যক্তিগত মতবাদ নয়। বরঞ্চ সারা ভারত জুড়ে বহু হিন্দু ধর্মমন্দির ঔরঙ্গাজেবের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত, ঔরঙ্গাজেব তার ব্যক্তিগত ধর্মমতকে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের কাজে লাগাননি। তৃতীয়ত, ঔরঙ্গাজেবের রাজত্বের শেষ দিকে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির কঠোরতা কমে আসছিল ; পরবর্তী সম্রাট বাহাদুর শাহের আমলে সেগুলি একেবারে নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু কৃষক আন্দোলনের তীব্রতাকে তা কমাতে পারেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৩৩.৫.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে কৃষক বিদ্রোহের অবদান

সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমে মুঘল রাজশক্তির ধারক ও বাহক মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তনির্হিত দুর্বলতা ও দ্বন্দ্বগুলি যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল ও সাম্রাজ্যের ক্ষমতার বুনিয়াদকে দুর্বল করেছিল, ঠিক সেই সময়ে মুঘল রাষ্ট্রকে আরেকটি বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল তা হ'ল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে পৌনঃপুনিক বিদ্রোহ। মুঘল রাষ্ট্র কোনদিনই জনসমর্থনের উপর নির্ভর করত না এবং মুঘল রাষ্ট্রের অতিরিক্ত অর্থনৈতিক দাবিকে কৃষিজীবী সমাজ এবং তার নেতৃত্ব কোনদিনই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সমস্ত মুঘল আমল জুড়ে বিক্ষিপ্ত ও ইতস্তত বিদ্রোহ দেখা যায়। দুর্ভেদ্য, অপরাজেয় মুঘল অশ্বারোহী বাহিনীর ভয়ে এইসব বিদ্রোহ কখনই চরম রূপ ধারণ করেনি। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথেমে রাজপুরুষদের শোষণের মাত্রা বাড়লে কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। তখন এইসব

বিদ্রোহকে পূর্বের মত প্রতিহত করার ক্ষমতা মুঘল সামরিক বাহিনীর ছিল না। একদিকে কেন্‌গ্‌দরীয় শক্তির দুর্বলতা ও অন্যদিকে জডনসমর্থনপুষ্ট আঞ্চলিক শক্তির উত্থান—এই দুই-এর চাপে পড়ে মুঘল সাম্রাজ্য আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে মুঘল সাম্রাজ্য একটি সমঝোতার উপর দাঁড়িয়েছিল। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংস্থান কৃষকের হাতে রেখে বাড়তি উৎপাদনের অধিকাংশ রাষ্ট্র আদায় করত। সামান্য কিছু অংশ জমিদারেরা নিতেন। সপ্তদশ শতকের শেষে এই বোঝাপড়ার অবসান ঘটে। সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যয় বেড়ে গেলে কৃষকদের শোষণ ও ইজারাদারি ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে রাজস্বের দাবি কৃষকের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দাবিকে অস্বীকার করে। এরই ফলে হয় কৃষক বিদ্রোহ—যা সাম্রাজ্যের বুননয়াদকে দুর্বল করে তোলে। মুঘল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জমিদার ও কৃষকের যৌত বিদ্রোহ ক্রমে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহগুলির প্রাথমিক সাফল্য মুঘল সাম্রাজেড্যর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে তার ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে দেয়। ঔরঙ্গজেব নিজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। তার উত্তরসূরীদের আমলে সমস্যার তীব্রতা বেড়েছে এবং ক্রমশ তা সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করেছে, ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ আরো সহজ হয়েছে।

মুঘর যুগে কৃষি-বিদ্রোহ, প্রাথমিক জমিদারদের বিদ্রোহ, জায়গীরদারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্তিম দশায় কোন নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা করেনি। বিত্তহীন কৃষকেরা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে উৎপাদিকা শক্তিগলির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেননিঃফলে নতুন কোন সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়নি। নবগঠিত সামন্ত রাজ্যগুলিতে শোষণের রূপ পূর্বের মতই থেকে যায়। সামন্তপ্রভুদের অধীনে হয়ত প্রথমে কিছুটা ররাজক্বের চাপ বাড়ে কিন্তু কিছুকাল পরেই কৃষকের অবস্থা দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে পড়ে।

৩৩.৬ সারাংশ

মুঘল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জায়গীরদারেরা একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশ করায়ত্ত করে কৃষকের জন্য ন্যূনতম মাত্রায় ফসল রাখা হ'ত এবং এই উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকাংশই একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণী ভোগ করতেন। নিয়মিত কর আদায় করা ছাড়াও তারা আরও বেআইনী করও আদায় করতেন ; এর ফলে কৃষিজীবী সমাজকে প্রচন্ড চাপের মধ্যে বসবাস করতে হ'ত। কৃষকের রাজস্বের উপর অপর দাবিদার ছিলেন জমিদার, মনসবদারি ব্যবস্থার অন্তর্গত করে মুঘল রাষ্ট্র প্রাক্-মুঘল যুগের এই ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অবস্থানকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জমিদারদের মধ্যে ছোট-বড়, মাঝারি নানারকম স্তরবিন্যাস দেখা যায় কিন্তু তারা প্রত্যেকেই পরশ্রমজীবী শোষক শ্রেণী। কৃষক ছিলেন মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। উপযুক্তভাবে জমি ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের নানারকম সাহায্য করতেন আবার রাষ্ট্রের দেয় রাজস্ব ঠিক সময়ে পরিশোধ না করলে কৃষককে নানারকমভাবে পর্যুদস্ত করা হ'ত। কৃষক সমাজের মধ্যেও নানারকম অবস্থানগত পার্থক্য দেখা যায়। উপরের দিকে ধনী কৃষক এবং তলার দিকে অগণিত ভূমিহীন খেতমজুর—উভয়ের দ্বন্দ্বে মুঘল কৃষিব্যবস্থা সমস্যাকীর্ণ ছিল।

নিয়মিত ও অনিয়মিত রাজস্বের পরিমাণ কালক্রমে এত বেশি হয়ে গেল যে, চাষ করা ক্রমে অলাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। অতিরি্কত রাজস্বে চাপ মুঘল কৃষ্টি ব্যবস্থায় সঙ্কট ডেকে আনে। সঙ্কট থেকে পতিত্রানের জন্য ইজারাদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পরে এটিচ আরও শোষণমূলক ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত হয়। শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রা

ণ পাবার জন্যে কৃষকেরা নিরুপায় হয়ে অস্তর ধরতে বাধ্য হয়। এই ব্যাপারে কৃষকের সহযোগী ছিল জমিদারেরা, কারণ কৃষিব্যবস্থার সঙ্কটের ফলে তারাও আগের মত উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতে পারে না।

মুঘল আমলের কৃষি-বিদ্রোহকে দুভাগে ভাগ করা যায়—(এক) প্রাক্-ঔরঙ্গাজেব আমলের কৃষি-বিদ্রোহ ; (দুই) ঔরঙ্গাদেজবের আমলে কৃষি-বিদ্রোহ। পূর্ব যুগের তুলনায় ঔরঙ্গাদেজবের আমলে কৃষি-বিদ্রোহের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশি। পরিণামে এরাই মুঘল সাম্রাজেড্যর পতন ডেকে আনে। এই সমস্ত বিদ্রোহের মধ্যে কোন কোনটি ছিল বিশুদ্ধ কৃষক আন্দোলন। এগুলি ধর্ম, ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতি্করয়ার গড়ে উঠেছে এবং কৃষক সমাজের স্তরবিন্যাস ছিল বিভিন্ন ; কিন্তু মারাঠা ও শিখ বিদ্রোহে রপাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও কৃষ্ক আন্দোলন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এবং পরিণামে এগুলি জটিল চরিত্র ধারণ করেছে।

৩৩.৭ অনুশীলনী

১। রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল আমলের কৃষি-বিদ্রোহের কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করুন।

(খ) মুঘল যুগের কৃষক বিদ্রোহের আধুনিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে আপনি কিভাবে উপস্থিত করবেন ?

(গ) ঔরঙ্গাজেবের আমলের কৃষক বিদ্রোহের বিবরণ দিন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল যুগের কৃষিসমাজের বিভিন্ন বিভাজনকে আলোচনা করুন।

(খ) উপজাতি আন্দোলনগুলির মধ্যে ধর্মের ভূমিকা কি ?

(গ) মারাঠা আন্দোলন কি মূলত কৃষক আন্দোলন ?

৩। অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) জায়গীরদারদের কোন পরজীবী শোষক শ্রেণী বলব ?

(খ) ইজারাদারি ব্যবস্থার কেন প্রবর্তন করা হয়েছিল ?

(গ) জাঠ কৃষক আন্দোলনের সফলতার কারণ কি ?

৪। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (সঠিক উত্তরে ( ) চিহ্ন দিন) :

(ক) জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর নাম—

(১) তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী

(২) তারিখ-ই-জাহাঙ্গিরী

(৩) জাহাঙ্গীর-নামা

(খ) সৎনামী কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করতে—

(১) ঔরঙ্গজেব কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

(২) সেনাপতিদের উপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

(৩) ঔরঙ্গজেব নিজে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

(গ) "চৌথ" ও "সরদেশমুখী" নামক দুটি কর—

(১) মুঘল জায়গীরদাররা আদায় করতেন।

(২) স্থানীয় শাসকেরা "আবওয়াব" হিসাবে গ্রহণ করতেন

(৩) মারাঠা শাসকেরা মারাঠা শাসন-বহির্ভূত অঞ্চল থেকে আদায় করতেন।

৩৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Habib, Irfan : *The Agrarian System of Mughal India.*
2. Roychoudhury, Tapan and Habib, Ifran (ed) : *The Cambridge History of India,* Vol. 1.
3. ভদ্র গৌতম : *মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ।*
4. বন্দ্যোপাধ্যায় শেখর : *অষ্টাদশ শতকের মুঘল সঙ্কট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা।*